অশনি-সংকেত ঃ নায়ক বিচার

বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় "অশনি-সংকেত" নাতিদীর্ঘ। এ উপন্যাসের কাহিনী বিশ্লেষণ করলে আমরা দটি প্রধান চরিত্র পাহ—গঙ্গাচরণ এবং তার স্ত্রী অনঙ্গ। অনঙ্গ নারী, কাজেই পুরুষ চরিত্র গঙ্গাচরণকে নিয়ে আমরা প্রথমে দেখব, সে এই উপন্যাসে কী ভূমিকা নিয়েছে বা তার কার্যকারিতা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতিকে কতটা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করেছে।

উপন্যাসের কাহিনীকে মোটামুটি দুটি পর্যায়ে ভাগ করলে দেখা যায় প্রথম পর্যায়ের কাহিনী প্রধানত গঙ্গাচরণের আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী। সে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে হরিহরপুরের পিতৃভিটে ত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছে এবং একাধিক গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। কিন্তু কোথাও সংসারের ব্যয় সংকুলান করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত এই নতুন গাঁয়ে এসে বাস করছে। এখানে সে গ্রামের সংগতিসম্পন্ন লোকেদের বলে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়েছে। নিজে উদ্যোগী হয়ে পাঠশালার জন্য উমেদারি করতে সে বিশ্বাস মশাইয়ের বাড়ি গেছে। ছাত্র কিছু হয়েছে। কিন্তু সে জানে ছাত্র যত বেশি হবে ততই সুবিধা। তাই পাঠশালার ছুটির পর সময় নষ্ট না করে সে সামান্য জলযোগ সেরেই বেরিয়ে পড়েছে পশ্চিম পাড়ায়। সেখানে গ্রামের মণ্ডপঘর-এ গ্রামবাসীরা জমায়েত হয়ে গল্পগুজব করে। গঙ্গাচরণ তাদের মাঝে গিয়ে তার পাঠশালার কথা বলেছে। তারা তার

পাঠশালায় ছেলে পাঠাতে রাজি হয়েছে। এছাড়া গঙ্গাচরণ আলোচনা প্রসঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছে, পৌরোহিত্য সে করে; কবিরাজি চিকিৎসাও তার অজানা নয়। তার চিকিৎসায় বিশ্বাসমশাইয়ের নাতি রোগমুক্ত হয়েছে। 'গাঁ বন্ধ' করতে তাকে যেতে হয়েছে দূরবর্তী কামদেবপুর গ্রামে। এ সব ব্যাপারে গঙ্গাচরণ খুব অভিজ্ঞ, চতুর এবং ভড়ংসর্বস্ব। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মন জয় করার জন্য বাংলা কথার মাঝে প্রায়ই সে সংস্কৃত জুড়ে দেয়। ফলে সিদ্ধি হয় গঙ্গাচরণের করায়ত্ত। এই পর্যন্ত ঘটনাচক্রে সব কিছুই গঙ্গাচরণের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। প্রতিকূল যা হতে পারতো তাকেও সে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং ভড়ং দিয়েই জয় করেছে। তবে সে শুধু নিজের স্বার্থই দেখেনি, তার সমানধর্মা দরিদ্র দুর্গা বাঁড়ুয্যে বা দীনু ভট্চাযের মত মানুষদেরও সাহায্য করেছে।

কিন্তু এরপরই দেখা দিল চালের অনটন ; বাজারে চাল মহার্ঘ হয়ে উঠল। চালের অভাবে মানুষ অখাদ্য কুখাদ্য খেতে লাগল। প্রথমে একজন দু'জন, পরে শত শত অন্নহারা মানুষে দেশ ভরে যেতে লাগল। গঙ্গাচরণের এখন আর আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, শুরু হল আত্মরক্ষার সংগ্রাম। এ সংগ্রাম সকলের। গঙ্গাচরণ সকলের সঙ্গেই পথে নামল খাদ্যের সন্ধানে। সে তার স্ত্রীপুত্র সমেত পরিবারটিকে রক্ষা করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। চাল পাওয়ার সম্ভাবনা যেখানে আছে বুঝেছে, সেখানেই গেছে। ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে পারমিট সংগ্রহের চেষ্টা করেছে, চালের দোকান লুঠ হলে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পড়তে সে কোন রকমে রক্ষা পেয়েছে। কাহিনীর শেষে অচ্ছুত মতি-মুচিনীর শব নিয়ে সে শ্মশানযাত্রা করেছে। কিন্তু যে দুর্বার গতিতে মন্বন্তর এগিয়ে এসেছে, সে গতি প্রতিরোধ করার শক্তি গঙ্গাচরণের ছিল না। আবার যেজন্য মন্বন্তর সংঘটিত হয়েছে, তাও গঙ্গাচরণের কোন কর্মফল নয়। উপন্যাসের সিংহভাগ জুড়ে যে ঘটনাপ্রবাহ চলেছে, তা মন্বন্তরকেই ত্বরান্বিত করেছে। গঙ্গাচরণ এই ত্বরিত গতিকে কোনভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি। কাজেই গঙ্গাচরণকে এ উপন্যাসের নায়ক বলা যায় না।

গঙ্গাচরণের স্ত্রী অনঙ্গ এ উপন্যাসের আদ্যন্ত বর্তমান। এক বর্ষীয়সী মহিলা এবং অনঙ্গ-বৌকে দিয়ে নদীর ঘাটে কাহিনী শুরু হয়েছে এবং অনঙ্গরই তীব্র আপত্তিতে বিপথগামিনী কাপালী-বৌয়ের গৃহে প্রত্যাগমন দিয়ে কাহিনী শেষ হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে অনঙ্গও তাদের সংসারটিকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে অক্লান্তভাবে শ্রম ও নিষ্ঠা দান করেছে। স্বামী উপার্জন করে এনেছে বাইরে থেকে, স্ত্রী সেই সামান্য সম্পদকেও সংসারের ভিতরে থেকে লক্ষ্মীর সহাস প্রসন্নতা ও সেবা দিয়ে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। অভাবের সংসারে সে যেন অন্নপূর্ণা; তার ভাণ্ডার যেন কিছুতেই ফুরোয় না। স্বামী ও পুত্রদের সে যেমন যত্ন করে, তেমনি অতিথি-অভ্যাগতরাও তার স্নেহচ্ছায়ায় অপার শান্তি লাভ করে। সে সংসারের ধারিণী শক্তি। স্বামী ছাড়াও তার নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। সে ছেলেদের নিয়ে গরুর গাড়ি চড়ে পূর্বের বাসস্থান ভাতছালায় বেড়াতে যায়। সেখানে পূর্বের প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে মধুর সৌহার্দ্যে কিছুদিন কাটিয়ে আবার গৃহে ফিরে আসে। সে মোটামুটি শান্তিতেই সংসার করছিল।

কিন্তু যুদ্ধের জেরে মন্বন্তর দেখা দিলে অনঙ্গকেও কিছুটা বিভ্রান্ত হতে হয়। তবু সে ভেঙে পড়ে না। স্বামীকে লুকিয়ে সে অপরের ধান ভানতে যায় সংসারে যাতে সাশ্রয় করতে পারে। মতি-মুচিনী এবং কাপালী-বৌ-এর সঙ্গে সে দুর্গম জঙ্গলে যায় মেটে আলু

তুলতে। খাদ্যাভাবের সময় নিজে অভুক্ত থেকে অনঙ্গ স্বামী-পুত্রদের মুখে খাবার তুলে দেয়। এমনকি অতিথিদেরও সে বঞ্চিত করে না। সে যে কোথা থেকে কী জুটিয়ে এনে সকলকে খেতে দেয়, তা গঙ্গাচরণও বুঝতে পারে না। নিজে না খেতে পেলেও মুখ ফুটে সে কোনদিন তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু সন্তান-প্রসবের পর তার রোগজীর্ণ শীর্ণ মূর্তিটি বড় করুণ হয়ে ওঠে। তবু সে বিবেক হারায় না, স্নেহ-মমতা তার সমগ্র সত্তা জুড়ে বিরাজ করে। তারই জন্য কাপালী-বৌকে সে বিপথগামিনী হতে দেয় না। তার স্নেহমমতার চরম প্রকাশ দেখি, যখন সে জাত্যভিমানী তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষগুলিকে অচ্ছুত মতি-মুচিনীর মৃতদেহ সৎকার করার জন্য প্রণোদিত করে। মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে শ্রেণী-চেতনার যে কালান্তর ঘটেছে এই উপন্যাসে অনঙ্গই তার পুরোধা। ডঃ বারিদবরণ ঘোষ বলেছেন, এ উপন্যাসের সমাপ্তিতে যে মহৎ কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান হল তার পুরোহিত যদি বলি গঙ্গাচরণকে, তবে অনঙ্গ তার তন্ত্রধারিকা। প্রেরণা এবং নির্দেশনা অনঙ্গই দিয়েছে। তবু অনঙ্গকে এ উপন্যাসের নায়িকা বলা যাবে না। কোন মানব বা মানবী এ উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকা নয়। কারণ যে সর্বনাশা মন্বন্তরের ইঙ্গিত এ উপন্যাসের মর্মকথা, সেই মন্বন্তরের গতিপ্রকৃতিকে রোধ করার মত শক্তি কোন সাধারণ মানুষের ছিল না। গ্রামবাংলা সেদিন শ্মশান হয়ে গিয়েছিল; মানুষ কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। কবির লেখনীতে চিরন্তন হয়ে আছে সেই করুণ ছবি ঃ

'গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে—
শূন্য ঘর, শূন্য গোলা,
ধান-বোনা জমি আছে পড়ে।
শুকানো তুলসীর মঞ্চে
নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে,
আগাছায় ভরেছে উঠোন।'

—[স্বাগত ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়]

তাহলে 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসের কাহিনীর নিয়ন্তা কে? অগ্নিগর্ভ কৃষ্ণ মেঘের রূপ ধরে যে বাঙালীর ভাগ্যাকাশে ঘনিয়ে এলো, সেই মন্বন্তর। সেই দারুণ দুঃসময় সেই মহাকাল এ উপন্যাসের নিয়ন্তা এবং মহানায়ক। বিভূতিভূষণ তাঁর অনেক উপন্যাসেই কোন মানব-মানবীকে নায়ক বা নায়িকা করেননি। যেমন 'পথের পাঁচালী'তে যুগযুগান্তব্যাপী যে অখণ্ড জীবনপ্রবাহ, তার অধিদেবতাই নায়ক, 'আরণ্যক'-এ অরণ্যপ্রকৃতি নায়ক এবং 'ইছামতী'র নায়িকা ইছামতী নদী। কাজে 'অশনি-সংকেত'-এ সময়কে সঙ্গতভাবেই নায়ক বলা যায়।